



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পের মেহের আলি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোলের বালা’ গল্পের
পূর্ণিমা : দুই তথাকথিত পাগল চরিত্রের মানসিক প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ

Bandana Sautya¹ & Dr. Sanchita Banerjee Roy²

1. Research Scholar, Department of Bengali, YBN University, Ranchi
Email: bandana.sautya@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of Bengali, YBN University, Ranchi
Email: banerjeesanchita28@gmail.com

Abstract:

আলোচ্য নিবন্ধের সূচনায় ‘পাগল’ শব্দটি ব্যবহারের সংবেদনশীলতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন জটিল দিক সম্পর্কে সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পের মেহের আলি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোলের বালা’ গল্পের পূর্ণিমা। মেহের আলিকে শাহীবাগের তুলার মাশুল-কালেক্টরের বিকল্প-সত্তা (Alter-ego) রূপে দেখানো হয়েছে, যিনি অতীত ও বর্তমানের (Illusions and Reality) দ্বন্দ্ব মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। প্রাসাদ-রাক্ষসের গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন ‘তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়’ বলে সতর্কবার্তা দিতে থাকেন। অন্যদিকে, অপক্লপ রূপবতী পূর্ণিমাকে তার দাদা পাগলাকালীর বালা পরানোর উদ্দেশ্যে সুদূর তিরোলে নিয়ে যাচ্ছেন। পূর্ণিমা দুই মাস ধরে নীরব থাকলেও, অপরিচিত পরিবেশে তার মানসিক ভারসাম্য লজ্জিত হতে পারে -এই আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, অতিথিপরায়ণ এই তরুণীর আচরণে ফ্রেয়েডীয় জীবন-মৃত্যু দ্বিপক্ষবাদের (Life and Death Polarity) জটিল মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে, যা তাকে চরম মুহূর্তে আত্মরক্ষার তাগিদে পরঘাতী করে তুলেছে। এই দুটি চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকদ্বয় মানসিক বৈকল্যের জটিলতা ও মনস্তত্ত্বের গভীরতাকে উন্মোচন করেছেন।

Key Words: পাগল, মানসিক প্রতিবন্ধী, পাগল চরিত্র, বাংলা ছোটগল্প, ক্ষুধিত পাষণ, মেহের আলি, তিরোলের বালা, পূর্ণিমা।

Introduction:

‘পাগল’ শব্দটি সাধারণত এমন ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা মানসিকভাবে অসুস্থ বা আচরণগতভাবে স্বাভাবিক নয় বলে মনে করা হয়। তবে, এটি একটি অসম্মানজনক এবং অসংবেদনশীল শব্দ হতে পারে, বিশেষ করে যখন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়। মানসিক অসুস্থতার বিভিন্ন ধরন এবং স্তর রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই চিকিৎসা এবং সমর্থনের প্রয়োজন আলাদা। মানসিক অসুস্থতার সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে- আচরণগত পরিবর্তন, ভাবনা এবং অনুভূতির

অসামঞ্জস্যতা, ঘুমের সমস্যা, সামাজিক সম্পর্কের সমস্যা, উদ্বেগ এবং হতাশা, হ্যালুসিনেশন বা বিভ্রান্তি। এটি একপ্রকার মানসিক রোগ, যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, বা সিভিলিয়ার ডিপ্রেসন বোঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এই রোগে আক্রান্তরা মানসিক প্রতিবন্ধী। তাছাড়া, এই শব্দটি কখনও কখনও সাধারণ কথোপকথনে মজা করে বা ভালোবাসা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি অনেক জটিল এবং স্পর্শকাতর বিষয়। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় কোনো কোনো গল্পকার কাহিনীর প্রয়োজনে এমন ‘পাগল’ চরিত্রকে গল্পে স্থান দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু’টি চরিত্র হল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পের মেহের আলি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোলের বাল্য’ গল্পে পূর্ণিমা।

Discussion:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ (শ্রাবণ, ১৩০২, সাধনা) গল্পে মেহের আলির প্রথম আবির্ভাব—

“আমাদের পাগলা মেহের আলি”^১

শাহীবাগের তুলার মাশুল আদায়কারী কালেক্টর বাবুটির কাছে বিজন প্রাসাদ ক্রমশই জীবন্ত হয়ে উঠছিল। খন্ড আমি এবং অখন্ড আমার মধ্যে বারবার যাতায়াতের মধ্যে গড়ে ওঠা illusion, super-natural, suggestion, reality -এই সবার মধ্যে একটি চরিত্র মেহের আলি। অতীত এবং বর্তমান মিলে মিশে এক অখন্ড জগৎসত্তা গড়ে ওঠার অপর নাম মেহের আলি। প্রতিদিন সকাল বেলা মেহের আলি রাস্তা দিয়ে চিৎকার করতে করতে হেঁকে চলে—

“আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে ‘তফাত যাও’ ‘তফাত যাও’ করিয়া চিৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।”^২

মেহের আলির এই স্বল্প উপস্থিতি তার প্রাত্যহিকতার স্মারক রেখে যায়। সে প্রতিদিনই এ রাস্তা দিয়ে একই সময়ে একই কথা আওড়াতে থাকে। এই স্বল্প কথা নিয়ে চরিত্রটির দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটে কাহিনীর শেষভাগে। এ পাষণপূরী নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে ‘সঙ্গিনীহীন’ মাশুল-কালেক্টর বাবুটি যখন ক্রমেই আরও নিমজ্জমান হয়ে পড়ছিল তখনই সহসা দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটল মেহের আলির। তার সেই সনাতন চিৎকার- ‘তফাত যাও, তফাত যাও’, সাথে যোগ হল নতুন কথা— “সব বুট হ্যাঁ, সব বুট হ্যাঁ।”^৩ দ্বিতীয়বার মাশুল-কালেক্টর স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে এল।

এই পাষণপূরীর করাল গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য মাশুল কালেক্টর গুলবাগকে পরিত্যাগ করে জিনিসপত্রসহ আফিসঘরে গিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিকাল হতেই সেই পাষণপূরীর অমোঘ আকর্ষণ এড়াতে না পেরে নিজেরই অজান্তে গোখুলি মুহূর্তে ধাবিত হয়ে এসে পড়েছিলেন সেই ক্ষুধিত পাষণেই। সমগ্র রাত্রিব্যাপী তিনি ওই পাষণপূরীতেই এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়তায় যাপন করলেন। পাষণপূরীর কাছে সবাই ধরা দেয়, আজ সেই পাষণপ্রতিমা মাশুল-কালেক্টরের কাছে ধরা দিয়ে কাতর আবেদন জানিয়েছে মুক্তি বাসনায়। কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়বার ফিরে এলেন বটে পতঙ্গের মত বহির আকর্ষণে কিন্তু সে বহি তখন জলধারায় রূপান্তরিত হয়ে ঝরে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সেই রাতের অবসান ঘটল—

“পাগল চিৎকার করিয়া উঠিল, ‘তফাত যাও, তফাত যাও! সব বুট হ্যাঁ, সব বুট হ্যাঁ’। দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এর ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যন্ত চিৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল,

হয়তো ঐ মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘মেহের আলি, ক্যা বুট হ্যায় রে?’ সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল, ‘তফাত যাও, তফাত যাও, সব বুট হ্যায়, সব বুট হ্যায়’।”^৪

—এখানে একীকৃত হয়ে গেলেন মেহের আলি এবং মাশুল-কালেক্টর। প্রচ্ছন্নভাবে মাশুল কালেক্টরের বিকল্প-সত্তা রূপে মেহের আলির রূপকল্প নির্মাণ। কারণ মাশুল-কালেক্টর প্রথমার্ধেই মেহের আলিকে বলেছেন ‘পাগল’ আর শেষে নিজের অবস্থা বর্ণনায় নিজেকে ‘পাগল’ বলেছেন—

“আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম...”^৫

দুজনের মধ্যে এই alter-ego এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে- শিল্পীসত্তায় পাগলামো থাকতে পারে- শিল্পসাধনার প্রচলিত শৃঙ্খলাবোধে আসতে পারে উন্মাদনা, কিন্তু একজন উন্মাদ কখনোই শিল্পী হতে পারে না। কারণ উন্মাদ নিজের প্রতি নিজের জীবনের প্রতিই ছন্দ-শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলেছে সে করে নতুন সৃষ্টি করতে পারে না। শেষে কালেক্টর আপিসের করিম খাঁ সাহেবের কাছ থেকে জানা গেল মেহের আলির পূর্বপরিচয়। এলাকার লোকজনের কাছে সুপরিচিত মেহের আলি—

“যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।”^৬

তথ্যটিতে উল্লেখ্য কালেক্টর সাহেব পাগলের পরিচয় দিলেন ‘আলি’ বলে আর কালেক্টর বাবুর মত আগন্তুকদের কাছে সে মেহের। মেহের নামটি লক্ষ্যণীয়। ইসলাম রীতিতে মেহের নামটি পুংলিঙ্গবাচকও বটে আবার স্ত্রীলিঙ্গ বাচকও বটে। নামটির অর্থ সহৃদয়বান মানুষ। সিংহ রাশি এবং মথা ও অশ্লেষা নক্ষত্রের সঙ্গে নামটি সংযুক্ত।

প্রথম আবির্ভাবে মেহের আলির চিৎকার এবং কাফ্রি খোজার তলোয়ার মেহের আলির পূর্বজীবনের ইতিহাস বলে। মেহের আলিও হয়ত প্রাসাদকন্যার ‘মোহিনী-সর্পিনী’ আকর্ষণে আবিষ্ট হয়ে পড়ে কাফ্রি খোজার উদ্ধত শাস্তির কোপে পড়েছিল। তাই মেহের আলির কথা বলার আগে এল—

“ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খন্ড চাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মত পাণ্ডুবর্ণ”^৭

—উপমার সার্থক প্রয়োগে দু’পায়ের ফাঁকে খোলা তলোয়ারের সশব্দে পতন কি neutralization-এর ইঙ্গিত দিচ্ছে কোনোভাবে? তাই হয়ত আলি আজ মেহের নামে সম্বোধিত। প্রাসাদের ‘ক্ষুধার্ত’, ‘ভৃগুধার্ত’ নারীসত্তা ‘সজীব মানুষ’ অর্থাৎ পুরুষ মানুষ পেলেই গিলে ফেলতে চায়। মেহের আলি এই পাষণীর কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে ভয়ঙ্কর খেসারত দিয়ে। তাই আজও সে তার চারপাশেই ঘুরে ঘুরে রক্ষা করে বেড়ায় যাকে পরিবৃত্ত হয়ে থাকা সত্ত্বেও যাকে ভোগ করতে সে পারেনা। আর সর্বদাই সবার প্রতি সতর্কবাণী শোনাতে থাকে— ‘তফাত যাও, তফাত যাও’।

মেহের আলির সর্তকবাণী তার নিজের প্রতি, যে আর জড়িয়ে পড়ে না, মাশুল-কালেক্টরের প্রতি, যিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সতর্কীকরণ প্রাসাদের প্রতি, যে প্রাসাদ একদিন ভালোবাসার মোহে ছিল ‘মোহিনী-সপিনী’ কিংবা আজ প্রতিহিংসাপরায়ণার ত্রুরতায় হয়ে উঠেছে ‘অজগর’। বাদশাহী হারেমের অতুল ঐশ্বর্যময়তার অন্তরালে কারাগারে বধ্য যে জীবনাকাঙ্ক্ষা সেই মেহের আলির জবানীতে সাবধান করছে এই মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথাটিকে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোলের বালা’ গল্পে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দের মতই অপরূপ রূপবতী যুবতী পূর্ণিমা, জাতিতে ব্রাহ্মণ বয়স এই সতেরো-আঠারো। বাড়ি সুদূর ধানবাদের কাছে সয়লাডি কলিয়ারি। বাড়িতে বাবা আছেন। মা নেই। বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সে স্মৃতি কখনো পূর্ণিমার থাকে, কখনোও আবার সে নিজেকে অবিবাহিত মনে করে বলে বাবা হয়ত এ বছরই তাকে পাত্রস্থ করবেন। পূর্ণিমা পাগল, উন্মাদ। দাদার সঙ্গে অনেকটা পথ ট্রেন-নৌকা গরুর গাড়ি ইত্যাদি অনেক কিছু পেরিয়ে সে চলেছে তিরোলে। কথিত আছে সেখানকার পাগলাকালীর বালা ধারণে সফল মেলে উন্মাদ রোগগ্রস্তদের। এ যেন চাঁদের কলঙ্ক। গায়ের রং তার ধপধপে ফর্সা, বড় বড় চোখ। আর ঠোঁটের উপরটা কেমন যেন ঈষৎ বেঁকানো হয়ে মুখশ্রীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। আর কণ্ঠস্বরও সুমিষ্ট সেতার ঝঙ্কারের মতই অনুরণিত। পোশাক-আশাকও তার পাগলামির চিহ্ন বহন করে না। তবে তার ছাপা সিল্কের শাড়ি এবং পায়ে মাদ্রাজী চটির সঙ্গে একটু বেমানান তার মাথার চুলের অবিন্যস্ত বন্ধন। মার্টিন কোম্পানির রেলগাড়িতে দাদার সঙ্গে পূর্ণিমা চলেছে। পথে কথকের সাথে দেখা সহযাত্রী হিসাবে।

পূর্ণিমা এবং তার দাদা এক ট্রেনে পাশাপাশি চলেছে। সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে টুকটাক কথাবার্তা চালালেও এই দুই সহযাত্রী অস্বাভাবিক রকমের চুপ। লোকজনের চোখে তা অনেকটাই সন্দেহজনক। কারণ পূর্ণিমার নৈঃশব্দ্য। অনেকেই ভাবছে এটা হয়ত ইলোপ কেস হতে পারে। কারণ পূর্ণিমা বেশ সুন্দরী, বয়সটাও কম। পাশের ছেলেটি দাদা-বোন হতে পারে আবার মামা-ভান্নীও হতে পারে। কিংবা প্রেমঘটিত কোনো সম্পর্ক। পূর্ণিমার আচরণে না আছে আপাত কোনো উন্নতা, আবার নেই কোনো সহৃদয়তা-আন্তরিকতা। এরপর অবশ্য পূর্ণিমার দাদা যখন সহযাত্রী কথকের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপচারিতায় রত হল, তখন পূর্ণিমার ব্যবহারেও এল আন্তরিকতার ছোঁয়া। সহযাত্রীর প্রতি আতিথ্য-সৎকার ক্রিয়াতে মোটেও আন্তরিকতার অভাব নেই পূর্ণিমার আচরণে। দাদা ও বোন তিরোলের পথে যাবার সময় নিজেদের সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিল। লুচি, পটলভাজা, আলুচচ্চড়ি। পথে আবার বর্ধমান থেকে কিছু পরিমাণ মিহিদানাও কিনে নেয়। অতিথিকে পথে হলেও যথাযথভাবেই আদর-আপ্যায়ণ করে পূর্ণিমা।

এ পর্যন্ত তার আচরণে কোনো পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। এমনকি মিহিদানা খেতে দেবার সময় সে অত্যন্ত বিনীতভাবেই জানতে চেয়েছে যে খাবারটা মিষ্টিটা কোনোভাবে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার দরুণ নষ্ট হয়ে গেছে কি না। অতি সুন্দরী তরুণী, তদুচিত সুমধুর ব্যবহার। পূর্ণিমার দাদার কথা থেকে জানা যায় দীর্ঘ দুইমাসব্যাপী সে চুপ করে আছে। তাই ভয় কখন আবার ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্ণিমাকে সামলানো খুবই কষ্টকর। পূর্ণিমার এই উন্মাদ দশা ঘটে অপরিচিত মানুষদের সান্নিধ্যে। অথচ আশ্চর্যের কথা কথকও তো পূর্ণিমার কাছে অপরিচিত-বাইরের লোক। কিন্তু প্রথম আলাপে কোনোরকম আচরণের উগ্রতা তার মধ্যে দেখা দেয়নি। পূর্ণিমার দাদা বোনের এই পাগলামির উৎস জানতেন। কিন্তু বিধাতার লেখা কি আর খড়ানো যায়। সুদূর তিরোল যাবার পথে একা পাগলি বোনকে নিয়ে যাবার রিস্ক নিতে পারল না পূর্ণিমার দাদা। সাথে কথককে নিলেন সহযাত্রী সহকারী সহযোগী হিসাবে।

ট্রেনের যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় সমাজ-দেশ সম্পর্কিত আলোচনায় যখন পথশ্রম লাঘবে ব্যস্ত, তখন পূর্ণিমা একধারে দাদার সাথে বেঞ্চিতে এককোণে বসেছিল। তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। জানলা দিয়ে সে একদৃষ্টে সবকিছু দেখেছিল। ট্রেন যতই এগিয়ে চলতে থাকল ততই ভিড় কমতে লাগল। ডেলি প্যাসেঞ্জারর যে যার নিজের স্টেশন আসাতেই নেমে গেল। গাড়ি ফাঁকা। পূর্ণিমা, তার দাদা এবং কথক। এই তিনজন মাত্র রয়েছে কামরাটিতে। জাঙ্গিপাড়ায় বাকি সব যাত্রীরাই নেমে গেছেন। পরবর্তী স্টেশন আঁটপুর। এখানে ভাল করে পূর্ণিমার পরিচয় পাওয়া গেল। তার সাজসজ্জায় বিবাহের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। তবে সহযাত্রীর সাথে এতটা রাস্তা একটাও কথা না বলায় কথকের মনে হয়েছে তরুণ-তরুণীটির আসার পথে কোথাও বোধ হয় ঝগড়া হয়েছে। তাদের দুজনের সম্পর্ক ঠিক কি ভাই-বোন, মামা-ভাঙ্গী না কি প্রেমিক-প্রেমিকা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ঘটে পূর্ণিমার ব্যবহারের উদাসীনতায়।

নামার আগের স্টেশন পিয়াসাডায় শেষ স্টেশন চাঁপাডাঙায়। পূর্ণিমার দাদাই প্রথম কথা বলল কথকের সাথে। পূর্ণিমার দাদা জানতে চেয়েছিল চাঁপাডাঙা স্টেশন থেকে নদী কতদূর। পূর্ণিমার আচরণ যে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল জনমানসে তা আরও বেড়ে যায়। পূর্ণিমারা কোথায় যাবে এই অজপাড়া গাঁয়ে প্রত্যন্ত রাস্তা-দেশে। কারণ তাদের পোশাক-আশাক যথেষ্ট ভদ্রজনোচিত শৌখিনতার সাক্ষ্য বহন করছিল। অবশেষে যুবকটিই সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে জানায় স্টেশন থেকে নদী পার হয়ে তারা আরও কোনো গাড়ি করে সুদূর তিরোল যেতে চায়। কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত। সঙ্গে থাকা পূর্ণিমা তার বোন। এই বোনের জন্যই পাগলাকালীর বালা আনার উদ্দেশ্যে তাদের এই এতদূর আসা—

“-ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে- আমার বোন, কাল অমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম-”

এই এতদূর পথ, বিদেশ-বিভূঁই, অন্ধকার, সাথে পাগলি বোন-যুবতী সুন্দরী পূর্ণিমা তাকে নিয়ে একা ভরসা না পেয়ে যুবক কথকের সাহায্য চায়।

পূর্ণিমার আকর্ষণে কিংবা সহানুভূতি অথবা যুবকের অবস্থার কারণে বুঝতে পেরে কথক মানবিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের মেসোমশাই-এর অসুস্থতায় মাসির বাড়ি যাবার বদলে আগে তাদের সাথে যাবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাত হয়ে যাওয়ায় চাঁপাডাঙা স্টেশনেই কারো বাড়ি আশ্রয় নেবার কথা বললে পূর্ণিমার মানসিক অবস্থার জন্য সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। কারণ পূর্ণিমার এ পর্যন্ত আচরণ অতি শান্ত। একটাও কথা বলেনি সে। তার দাদার কথা থেকে জানা যায়—

“চুপ করে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন।”

কখন যে সে আবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে সেটাই আশঙ্কার কারণ। পূর্ণিমার দাদার কথা অনুযায়ী অপরিচিত লোকের মাঝেই তার মানসিক ভারসাম্য লজ্জিত হয়। সে এক প্রচলিত রুদ্র মূর্তি সে ধারণ করে। দাদার হাতে ছাড়া কারো হাতে সে খায় না অবদি। অথচ বিস্ময়ের কথা হল, এই অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে পূর্ণিমার দাদা যখন কথা বলছে তখন পূর্ণিমার কোনো অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয় না।

গরুর গাড়ির ছই-তে বসে পূর্ণিমার প্রথম কথা শোনা গেল। একেবারেই স্বাভাবিক সে কণ্ঠস্বর এবং কথোপকথন। নদীর কাছাকাছি ঠান্ডার অনুভূতির কথা সে জানায় তার দাদাকে। যদিও কথকের কথানুসারে সেটাতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু বৈশাখী সন্ধ্যায় চাদের গায়ে দেবার মত শীতানুভব বিশেষ অন্য তিনটি মানুষের সেরূপ অনুভব না হওয়া একটু অস্বাভাবিকতা

বটে। যদি সত্যিই এতটাই ঠান্ডা লাগত। তাহলে সাথে সাথে গায়ে কিছু দেবার ব্যবস্থা করত নিশ্চয় পূর্ণিমা। বিশেষত সাথে যখন রয়েছে চাদর এবং তার দাদা সেকথা তাকে স্মরণও করায়। কিন্তু এতটাই মানসিক চাপ্তল্য পূর্ণিমার যে তৎক্ষণাৎ সে নদী দেখে দামোদর-এর কথা বলতে থাকে। ছোটবেলায় মামারবাড়ির স্মৃতি ভেসে ওঠে পূর্ণিমার। বর্ধমান জেলার দামোদরের ধারে বল্লভপুর গ্রামে শৈশবে দুবার মামারবাড়ি গেছিল পূর্ণিমা। কিন্তু তারপর আর কি হয়েছিল সে ব্যাপারে একটা ধাঁধার সৃষ্টি করে পূর্ণিমার দাদার ‘তারপরে’ শব্দবন্ধ এবং যতিচিহ্নের ব্যবহার। এই নদী, নদীর সাঁকোর উপর দিয়ে গরুর গাড়ি যাত্রা- যাত্রাপথের দৌল্যমানতা মৃত্যুভয় সৃষ্টি করেছিল পূর্ণিমার মধ্যে।

এ পর্যন্ত পূর্ণিমার আচরণে খুব একটা বেশি অস্বাভাবিকতা অবশ্য বলা যাবে না। কারণ অল্পতেই ভয়ভীত হওয়া নারীচরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম। আর নদীযাত্রাপথে সমপ্রায় যাত্রাপথের পূর্বস্মৃতি স্মরণে আসাও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মানবমনস্তত্ত্ব বলে মানবমন মাকড়সার জালের মতই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে যথেষ্ট জাল বোনে। সাহিত্যতত্ত্বের ভাষায় stream of consciousness কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

ট্রেনযাত্রা, এরপর গরুর গাড়িতে তারপর নৌকায় নদীপথ পেরোনো, এরপর আরও একপ্রস্থ গাড়ির প্রয়োজন। সেটার জন্য সহৃদয় গাড়োয়ান তিন সওয়ারীকে গাড়িতেই বসতে বলে পরবর্তী গাড়ির উদযোগে বাস্তু হয়ে পড়ে। এই সময় পূর্ণিমার উদ্যোগেই কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা হয়। এত দূর পথ অতিক্রম করার জন্য পূর্ণিমাদের সাথে লুচি, পটল ভাজা, আলুচচ্চড়ি এবং বর্ধমান থেকে কেনা মিহিদানার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ণিমা ক্ষুধা অনুভব করায় দাদা এবং বোন শুধু নয়, কথককেও যেভাবে খাবারের জন্য বলেছিল তাতে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা তো ছিলই না, বরং এক মমতাময়ীর আন্তরিকতাই পরিস্ফুট। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে সুদূর উলাপুর গ্রামে অসুস্থ অবস্থায় যেমন পোস্টমাস্টার বালিকা রতনের সেবাস্পর্শে বাড়ির মা-দিদির স্নেহসান্নিধ্য অনুভব করেছিল, কথকও তেমনি পূর্ণিমার আচরণে অপরিচিতের সংকোচ বা মানসিক বৈকল্যের কোনো লক্ষণ তো পানই নি, উল্টে গৃহপরিবেশ আর মা-বোনের সান্নিধ্যে চির-পরিচিত পরিবেশের স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করেছিল।

পূর্ণিমার আচরণে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা ছিল না। অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ কোনো সংকোচ বা নারীসুলভ লজ্জাও ছিল না। বরং বর্ধমান থেকে আসার পথে কেনা মিহিদানাটার গুণগতমান নিয়েও যথেষ্ট স্বাভাবিক কথোপকথনই হয়। বরং কথককেই পূর্ণিমা বলেছে খেয়ে দেখতে রাস্তায় কেনা মিহিদানাটা ভাল আছে কিনা। এতে রাস্তায় পথচলতি দোকানের খাদ্যের গুণগতমান সম্পর্কে ক্রেতার সাধারণ concern এবং তার সাথে অতিথির সঙ্গে একেবারেই ঘরের লোকের মত অকুণ্ঠ ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ণিমা কিন্তু একবারও বাকি খাবারগুলি মানে লুচি, পটলভাজা বা আলুচচ্চড়ি বিষয়ে জানতে চায়নি। কারণ সে জানে এই খাবারগুলো ঠিকই থাকবে।

আহার পর্ব শেষ হতে হতেই মাঝি ভাই পরবর্তী স্তরের জন্য গরুর গাড়ি জোগাড় করে নিয়ে আসেন। তাকে তার প্রাপ্য ভাড়া এবং বকশিস দিয়ে পূর্ণিমারা তিনজন গাড়িতে উঠে রওনা দেয়। কিন্তু গারোয়ান তামাকের টিনটা আনতে ভুলে যাওয়ায় গ্রামপথ শামকুড় দিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। এই গ্রামপথ গ্রাম্য পরিবেশে পূর্ণিমা কথকের সঙ্গে স্বাভাবিক কথোপকথন শুরু করেছিল। কথকের মাসিমার বাড়ি বর্তমান অবস্থা থেকে কতদূর জানতে চায় পূর্ণিমা। কথক জানিয়েছিল দূরত্ব বেশ খানিকটা। কারণ তিরোল আর মাসিমার বাড়ি এক রাস্তায় নয়। সম্পূর্ণ বিপরীত পথ। এর পরবর্তী কথোপকথনও অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অভিপ্রের্ত। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই যুবক-যুবতীর সাহায্যের জন্য এই এতটা রাস্তা আসা কথকের পক্ষে ক্লেশদায়ক কিনা তা পূর্ণিমা বলতে কথক অত্যন্ত বিনীতভাবেই জানায়, তাতে ক্লেশের কণ্টের কিছু নেই। এই কথা শুনে পূর্ণিমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে

হঠাৎ ছেলেমানুষী হাসিতে ফেটে পড়ে। এক সুন্দরী যুবতীর এহেন হাসি, বিদেশি বিড়ুই-এর বৈশাখী সন্ধ্যায় গ্রাম্য পরিবেশে প্রথমে সহৃদয় আতিথ্যের পর মুগ্ধতাবোধের সঞ্চার করলেও, প্রাথমিক আবেশ কেটে গেলেই যুবকের কানে অপ্রকৃতিস্থতার শব্দ শুনিত করে।

পূর্ণিমার দাদা আন্দাজ করতে পারছিল পূর্ণিমার দীর্ঘ দুইমাস নিঃশব্দের পর কথা বলা এবং হাসি হয়ত কোনো বড় ঝড়ের সংকেত হতে পারে। হলও তাই। গাড়ী আরেকটু কিছুদূর এগোতেই পূর্ণিমা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দাদার প্রাথমিক প্রতিরোধ দাঁতের কামড়ে প্রতিহত করে গরুর গাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যায়—

“ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ী থেকে নেমে পড়তে চাইছে-

...যুবকটি বেদনার্ত কণ্ঠে উহ্-হহ বলে উঠল। পরক্ষণেই বললে- কামড়ে দিয়েছে হাত ধরবেন না, ধরবেন না-”^{১০}

গাড়োয়ান তরুণ। আর জানাই থাকে তিরোল যাত্রীদের মধ্যে কেউ না কেউ উন্মাদ হয়ই, কিন্তু সে যে এই পরমাসুন্দরী যুবতীটি তা বোঝা যায় পূর্ণিমার আচরণে। পূর্ণিমা পালিয়ে যায়। তারপর অবশ্য গাড়োয়ানের উপস্থিতি বুদ্ধি এবং তৎপরতায় পূর্ণিমার সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রামের এক গৃহস্থ রসিকলাল খাড়া, জাতিতে কৈবর্ত। তারই গোয়ালঘরে গিয়ে উঠেছিল পূর্ণিমা। এখানে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল পূর্ণিমা কিন্তু কোনো জলভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। গাড়োয়ান বা পূর্ণিমার দাদা পূর্ণিমা গাড়ি থেকে নেমে পরায় খাল বা জলার অংশগুলি প্রথমে ভাল করে সন্ধান চালায়। কিন্তু পূর্ণিমা আশ্রয় নিয়েছিল গৃহস্থের গোয়ালঘরে গরুদের সান্নিধ্যে। এরপর পূর্ণিমার আচরণ আবার শান্ত ও স্বাভাবিক। গৃহস্থামীর অনুরোধে পূর্ণিমারা সেই রাতটুকু সেই বাড়িতেই থাকার উদ্যোগ করে। কৈবর্তের রীধা ভাত যেহেতু ব্রাহ্মণদের গ্রহণীয় নয়, তাইজন্য রান্নার সমস্ত জোগাড় রসিকলাল দিয়ে গেলেও রান্নার ব্যবস্থা পূর্ণিমারাই করে। আবার পূর্ণিমার শান্তরূপ ফিরে আসায় এবারও রান্নায় বসে পূর্ণিমা নিজে।

রন্ধনরতা পূর্ণিমা নারীর পরিপূর্ণ রূপের আরেকবার পরিচয় দেয়। এখানেও পূর্ণিমার আচরণে কোনোরকম অসংলগ্নতা লক্ষিত হয় না। বরং রান্নার সময় সে তাকে দেখতে আসা মেয়ে-বৌদের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা ও রঙ্গরসিকতাও করেছে। বরং আবার দর্শনাধীদের পূর্ণিমা এটাও বলেছে যে সেও তো আর পাঁচটা মেয়ের মতই সাধারণ দুই হাত- দুই পা বিশিষ্ট; সুতরাং তাকে এত ঘটা করে সবার দেখতে আসার কিছু নেই। শুধু তাই-ই নয়, পূর্ণিমার বাড়ি-ঘর-বাবার নাম বয়স সবই সে যথাযথ জানিয়েছে। পূর্ণিমা নিজে থেকেই দাদাকে বেশ সহজ সুরেই জানিয়েছে পাড়ার লোক তার বৈবাহিক স্থিতি সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করায় সে জানিয়েছে তার বাবা এ বছরই তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

এখানে বলা যায়, পূর্ণিমার পোশাকে বিবাহের কোনো চিহ্ন ছিল না। ফলতঃ একজন সুন্দরী যুবতী অবিবাহিতা হলে সমাজের লোকের প্রশংসা সৃষ্টি হবেই। পূর্ণিমার দাদা যদিও ট্রেনেই জানিয়েছিল যে, পূর্ণিমা অপরিচিত লোকদের মাঝখানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে- ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, রসিকলাল খাড়ার বাড়িতে কিন্তু তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। বরং, সবার সঙ্গেই পূর্ণিমা বেশ সহজভাবেই মিশেছে। তার আচরণে একটিই মাত্র অসঙ্গতি দেখা গেছিল তা হল একেবারেই প্রথমে যখন সে রসিকলালের বাড়ি পালিয়ে আসে। রসিকলাল যে বুঝতে পেরেছিল পূর্ণিমা পাগল, তার কারণ ভরসন্ধ্যাবেলায় কোনো যুবতী পালিয়ে অপরিচিত মানুষের বাড়ি আসবে না। যদিও বা পথে কোনো বিশেষ বিপদে পড়ে কোনো গৃহস্থের বাড়ি আশ্রয় নিতেও হয়, তাহলে গৃহস্থের সদর দরজা দিয়েই শরণ নেবে, কখনই গোয়ালঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে না।

পূর্ণিমার দাদা কিন্তু পূর্ণিমার আচরণ খুব ভাল ভাবে জানত। অন্ততঃ জানা তো উচিত। সুদীর্ঘ পথশ্রম। ট্রেনে আসার সময় অনেক অনেক অপরিচিত মানুষ, তারপর বাকি অন্য যানবাহনেও বেশ কিছু অপরিচিত লোকের সঙ্গে যাত্রা। সব থেকে বড় কথা দাদা ও বোনের মাঝে একজন তৃতীয় ব্যক্তির সর্বদা উপস্থিতি। যেখানে দাদার বক্তব্য অনুসারে পূর্ণিমার অসুবিধা অপরিচিত লোকদের সান্নিধ্যেই। রসিকবাবুর বাড়িতে এসেই পাড়াসুদ্ধ মেয়েদের এসে পূর্ণিমার সঙ্গে আলাপ। এত কিছু চাপ পূর্ণিমার পক্ষে যে হানিকর হতে পারে সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দাদার আরোও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

রান্নাবান্নার পর রাত্রি এগারোটার সময় পূর্ণিমা দাদা এবং কথককে খাবার পরিবেশন করে। সামান্য ডাল-ভাতের আয়োজন। গৃহস্থামীর মেয়ে এরপর অতিথিদের জন্য দুধ নিয়ে এলে সুগৃহিণীর মতই পূর্ণিমা তাকে অন্য আরেকটি হাতা নিয়ে আসার কথাও বলে। ডালের হাতা এবং দুধের হাতা দুটিকে আলাদা রাখা উন্নত রুচিশীলতারই পরিচয় বহন করে। খাবার খাওয়ার সময় কথকের সঙ্গে স্বল্প আলাপচারিতায় পূর্ণিমার আন্তরিকতাই বেশি প্রকটিত। এইসময় সে কথককে সরাসরি দাদা সম্বোধন করে আত্মীয়তার জোরে তাদের বাড়ি আসার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। বিশেষতঃ পূজোর সময় বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন দুটি পূজোপ্যাণ্ডেল, সখের থিয়েটার দেখার আমন্ত্রণ জানায় পূর্ণিমা। পূর্ণিমা তাকে দেখতে আসা মানুষজনদের যে তার বৈবাহিক স্থিতি সম্পর্কে যা জানিয়েছে সেটা দাদার সামনে বলার সময় কথককে দেখে নারীসুলভ আচরণের পরিচয় দিয়ে চোখ টেপে। পূর্ণিমার এহেন আচরণে আবার স্বাভাবিক শান্ত স্নিগ্ধ কল্যাণী রূপ ফিরে এসেছে।

খাবার খাওয়ার আঘন্টার মধ্যে সবাই দীর্ঘ পথশ্রমে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে। রসিকলালের অতিথিবাসের দুটিঘরের বড়টিতে কথক একা এবং ছোটটিতে পূর্ণিমা এবং তার দাদার শোবার ব্যবস্থা হয়। সকালবেলা দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলায় ন'টার সময় জানলা দিয়ে উকি মেরে জানা যায়—

“পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বাঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল- সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে, পূর্ণিমার শাড়ি ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশী রক্ত নেই, কেবল শাড়ীর সামনের দিকটাতে যেন ছটকে লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে। নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোরে নিদ্রায় অভিভূত।”^{১১}

এরপর দরজা ভাঙার শব্দ বা দাদার মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাওয়াতেও কোনভাবে নিদ্রাভঙ্গ হয়নি পূর্ণিমার। পুলিশ এসে জোর করে ঘুম ভাঙায় পূর্ণিমার। বাড়িতে টেলিগ্রাম করে জানানো হলে বাবা আসেন। পূর্ণিমা পাগল হলেও আইনের হাত থেকে রেহাই পায় না। শ্রীরামপুর কোর্টে তাকে তোলা হয়েছিল দাদাকে হত্যার অপরাধে। কিন্তু এই পর্যায়ে কোনো জ্ঞান কাজ করেনি পূর্ণিমার। বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি তার কাছে কোনো রেখাপাত করেনি। পূর্ণিমা তার নিজস্ব জগতেই মজে ছিল। প্রভাবশালী বাবার প্রতিপত্তিতে ঘটনাটি যথাসম্ভব কম আলোড়ন সৃষ্টি করে ধামাচাপা পড়ে যায়। তবে বাবা আর তার পুত্রহন্তারককে ঘরে নিয়ে যেতে রাজী হননি। ফলে শ্রীরামপুর থেকে হাওড়া, তারপর সোজা রাঁচী। পাগলাগারদেই জীবনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে পূর্ণিমা।

এক করুণ মর্মান্তিক পরিণতি। পূর্ণিমা পাগল। তার প্রতি তার বাড়ির লোকের ব্যবহারে যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্যণীয়। পূর্ণিমা যে দাদাকে হত্যা করল, সেখানে সবটা দায় শুধু পূর্ণিমার উপরই বর্তায় না। তার দাদার ভূমিকা ছিল। দাদার তো আরও একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। বিশেষত কুটনো কোটার বাঁটিটি একবার যখন পূর্ণিমার হাতে পড়েছিল, তখন দাদার বা কথকের অথবা গৃহস্থের কারোর সেটা পূর্ণিমার নাগালের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আরেকটু সাবধান হলেই হয়ত এতবড় বিপদটা এড়ানো যেত। আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা যায়, পূর্ণিমার দাদা বলেছে পূর্ণিমার অসুবিধা অপরিচিত লোকের

মধ্যে। পূর্ণিমার বাবা তো বেশ অবস্থাপন্ন। এত অপরিচিত লোকের মধ্যে দিয়ে সুদূর তিরোলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থার বদলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত। একটা পাগল মেয়ের সাথে পাঠানো হল একটিমাত্র ছেলেকে! প্রত্যেকবার পূর্ণিমার আচরণে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে অন্ধকারে। অন্ধকার কোনোরকম ভয়াত পরিস্থিতির সৃষ্টি করত পূর্ণিমার জীবনে। হাওড়া থেকে রাঁচীর ট্রেনে যখন ওঠানো হল পূর্ণিমাকে তখনও কিন্তু সে জানে না তার গন্তব্য কোথায়। পথে পাতানো দাদা কথককে তখনও নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে সে ভোলে না। আর বাবার কাছ খোঁজ নেয় দাদার। কারণ দাদার কাছে সে তার কানের দুল দুটো খুলে রেখেছে। পরম বিশ্বাসভাজন দাদার প্রতি পূর্ণিমার এই ভয়ঙ্করী রূপের কারণ কি হতে পারে, যেখানে উগ্রমূর্তির পূর্ণিমা একমাত্র দাদার হাতেই খেত।

জ্যোতিষশাস্ত্র তথা নক্ষত্ররাশিবিজ্ঞান বলে থাকে চন্দ্র মানুষের জীবনের একটি বেশ প্রভাবশালী গ্রহ। মানুষের মানসিক স্থিতি-সুস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে চন্দ্র। চন্দ্রের প্রকোপেই মানসিক চাঞ্চল্য সূচিত হয়। নায়িকার জীবনের সাথেও চন্দ্রের যোগ এক গূঢ় দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। মেয়েটির নাম পূর্ণিমা। পূর্ণ চন্দ্র- চাঁদের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোক। সৌন্দর্যের পূর্ণমূর্তি। পূর্ণিমার চাঁদের আকর্ষণে যেমন জোয়ার-ভাটা হয়, পূর্ণিমার আচরণেও স্বাভাবিকতা এবং অসংলগ্নতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ-প্রত্যাকর্ষণের খেলা চলে। যে মেয়ে অপরিচিত জনসমাজে ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে, সেই আবার অপরিচিত এক যুবককে অতি সহজেই দাদা বলে সম্বোধন করে সম্বন্ধ পাতাতে পারে। রসিকলাল ধাড়ার বাড়িতে পাড়ার মহিলারা পূর্ণিমার খবর পেয়ে দল বেঁধে দেখতে এলে পূর্ণিমা তাদের সাথে সৌজন্যসূচক ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের কথাবার্তায় কৌতুক-আমোদও উপভোগ করেছে। তাহলে পূর্ণিমার মনের জটটা কোথায়? ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগের কোনোও পূর্বাভাস তো লক্ষ্যণীয় হয়নি তার মধ্যে। পূর্ণিমার দাদার কথা মতো দীর্ঘ নৈঃশব্দের পর হাসিটাই ভয়ঙ্করীর তান্ডবলীলার পূর্বলক্ষণ। কথকের কানেও অবশ্য কখনো কখনো এ হাসি নারীসুলভ মধুর ঝংকারের পর অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার তো সব ঠিকঠাক।

তিরোলের পাগলাকালীর বালা ধারণ করতে হয় অমাবস্যা। তামস যামিনী। পূর্ণিমার চূড়ান্ত পাগলামি অর্থাৎ নিজের হাতে দাদাকে খুন করার আগে যে পূর্বাভাস দেখা গেছিল অর্থাৎ গরুর গাড়ি থেকে দাদার প্রতিরোধ উপেক্ষা করে নেমে পড়া- দুটি ঘটনাই কিন্তু ঘটেছিল অন্ধকারে। পূর্ণিমার পাগলামির সঙ্গে অন্ধকারের কোনো সম্পর্ক রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আলোয় পূর্ণিমার আচরণ স্বাভাবিক-স্বচ্ছ। আর তার পাগলামির ঘটনাদুটিই ঘটেছে আলোহীনতায়। প্রথমবার পূর্ণিমা যখন গাড়ি থেকে নেমে পালাতে উদ্যত হয়েছিল, তখন লক্ষ্যণীয় তার দাদা প্রথমে কথকের কাছে সাহায্য চেয়েছিল বোনকে ধরে থামাতে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বলেছিল গায়ে গায়ে হাত দেবেন না। ওর চুল ধরে আটকানোর কথা বলেছিল পূর্ণিমার দাদা। বিশেষ লক্ষ্যণীয় দাদা পূর্ণিমার গায়ে হাত দিতে নিষেধ করেছিল। কারণ পূর্ণিমা তখন কামড়াতে শুরু করেছে। অর্থাৎ পূর্ণিমার এই আক্রমণ আত্মরক্ষাজনিত কারণে। পূর্ণিমার মধ্যে সবসময় একটা আতঙ্ক ভয় কাজ করেছে।

দ্বিতীয় উল্লেখ ঘটনা বলা যেতে পারে রসিকলাল ধাড়ার বাড়িতে রাত্রে খাবারের পর শোয়ার ঘটনাটি। কথকের ঘুমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটি ঘরে একা। আর পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে দাদা ও বোনের শোবার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎই কথক অনুভব করেছিলেন বুকের ওপর কিরকম যেন একটা ভারি-ভারি ব্যাপার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট। এটা ক্ষুধিত পাষণের মতই কথকের শ্রান্ত অবচেতন মনের কামনার উদগ্র প্রতিফলন বা সত্যই দামিনীর ন্যায় আত্মসমর্পণকারিণীর আত্মউৎসর্গের নিবেদন ছিল।

পূর্ণিমার আচরণের অসংলগ্নতা পাগলামির মূলে রয়েছে কোনো এক না পাওয়া। পূর্ণিমার মা নেই। উন্মাদিনী পূর্ণিমাকে বাবা ঘরে নিল না। একমাত্র সম্বল-সহায়-নির্ভরতা ছিল তার দাদা। পূর্ণিমার এই উন্মাদগ্রস্ততার বীজ শৈশবেই প্রোথিত। বিয়ের পর স্বামী ত্যাগ করেছে পূর্ণিমার পাগলামির জন্য। তাহলে নিশ্চয় পূর্ণিমার রোগ লুকিয়েই তাকে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পূর্ণিমাকে আসলে তার পরিবার বোঝা বলেই মনে করত। তাই-ই তো পাগল মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিতে চেয়েছিল। তার বাবার পরিবার সম্ভ্রান্ত পরিবার। পূর্ণিমার ভাতৃহত্যার ঘটনাটি তাই বাবা যথাসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে চাপা দিতে পেরেছিলেন। সেইরকমই কি আরও কোনোও ঘটনা আছে, মাতৃহীনা পূর্ণিমার শৈশবে, যা তার বাবা এবং পরিবার প্রভাব বিস্তার করে চাপা তো দিয়েছে, কিন্তু যার চাপ সহ্য করতে না পেরে পূর্ণিমার চাঁদ অমানিশায় ঢেকেছে।

পূর্ণিমার রহস্যবৃত্ত শৈশব, পূর্ণিমার হাতে দাদা খুন হবার মারাত্মক ঘটনাটি টেলিগ্রাম করে তাদের বাড়িতে জানানোর পর কোনো আত্মীয়-পরিজন-কুটুম্ব নয় বরং মাত্র তিনজন বন্ধু নিয়ে বাবার এসে ঘটনাটি যথাসম্ভব প্রভাববিস্তার করে মিটিয়ে ফেলার মধ্যেই পূর্ণিমার একাকীভূত-ভয়ভীত পরিবেশের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। প্রভাবশালী ধনশালী পিতার কন্যা হয়েও পূর্ণিমাকে মানসিক ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানোর বদলে তিরোলের বালা ধারণের ঘটনার মধ্যে কোথাও একটা যেন বিষাদের সুর লেগে রয়েছে। এই দুস্তর যাত্রাপথে উন্মাদিনীর পাশে রয়েছে তার একমাত্র দাদা। এই সবছবিগুলি মিলিয়ে এক দুর্ভাগিনীর কোলাজচিত্র অঙ্কিত হয়। দামোদর-মামারবাড়ি-মা; নদীপথযাত্রা; অন্ধকার রাত; প্রচুর লোকসমাগম; বিয়ের কথাবার্তা; পরিচিত-অপরিচিত সান্নিধ্য; রান্নাবান্না-ঘরকন্যা, নিশিষাপন; আর সব শেষে কানের দুল দুটির খোয়া যাওয়া সব ঘটনাতেই বারবার ঘুরে ফিরে আসা দুটি চরিত্র পূর্ণিমা এবং তার দাদা ভাই-এর রক্তে হাত-রাঙানো পূর্ণিমা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত-তিনকালের স্বচ্ছন্দ পদসঞ্চারণী পূর্ণিমার কখনোও কল্যাণী, কখনো বিধ্বংসী রূপের নারীর ট্রাজেডির বাণীরূপ ঝংকৃত হয়েছে।

Conclusion:

‘ক্ষুধিত পাষণে’র মেহের আলিকে সাধারণতঃ গল্পের স্বপ্নকল্পনার সীমানা রক্ষাকারী সজাগ প্রতীকরূপেই ব্যাখ্যা করা যায়। এ গল্পের কাহিনীর বাস্তব সত্যতা তার কাছে মিথ্যা- কিন্তু, একথা সে অন্যকে শোনায় না, শোনায় নিজে। কিন্তু এই সম্মোহন থেকে প্রতিদিনই নিজেকে বারবার সতর্ক করে, কিন্তু সে এই সম্মোহন থেকে কতটা মুক্ত এটাই আমাদের প্রশ্ন। আসলে ঐ মিথ্যাকে সে মনে মনে বিশ্বাস করে আর মুখে করে অবিশ্বাস। তাই সে ‘পাগল’ এই একই বিশেষণ গল্পবক্তা নিজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। যেমন- ‘আমি সেই জল ঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া...’। করিম খাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় এই যে, মানুষের চিত্তপদার্থ তার বাসভূমির মধ্যে অলক্ষ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে প্রভাবিত করে সেই মানসিক শক্তিসম্পন্ন বাসভূমি সেখানে বসবাসকারী অন্য মানুষের বোধির জগতে ছায়া বিস্তার করে। এটা শুধু করিম খাঁর বিশ্বাস নয়, লেখকের বিশ্বাস। মানুষের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকা রূপজ তৃষ্ণার প্রতি মোহ কী ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেহের আলি। সে এই ভ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তাই সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। না বেরোতে পারলে হয়তো প্রাণ হারাত।

অপরদিকে ‘তিরোলের বালা’ গল্পের পূর্ণিমার মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছে ফ্রয়েডীয় জীবন-মৃত্যু দ্বিপক্ষবাদ (life and death polarity)। পূর্ণিমার মধ্যে একদিকে কাজ করেছে জীবনমুখী শক্তি-যার প্রতিফলন ঘটেছে তার বিবাহ চিন্তা অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি প্রবৃত্তি (reproduction); আবার পাশাপাশি ক্রিয়াশীল থেকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (self-preservation) যার প্রভাবে সে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছে কামড়ে। এই কামড়ানোর মাধ্যমে আত্মরক্ষাতেই ক্ষান্ত হয়নি সে, ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর।

শেষে দাদাকে হত্যা করার মাধ্যমে তার মধ্যে সুপ্ত পরঘাতী মৃত্যুমুখী প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটেছে। ‘Eros’ এবং ‘Thanatos’-এর দ্বন্দ্বের ক্রিয়াশীলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পূর্ণিমার আচরণ।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৫৭)। গল্পগুচ্ছ, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৩২৩
২. পূর্বোক্ত
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৫
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৬-৩২৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৭
৬. পূর্বোক্ত
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৩
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ৬৮৬
৯. পূর্বোক্ত
১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৮৯
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯৩

Citation: Sautya. B. & Banerjee Roy. Dr. S., (2025) “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পের মেহের আলি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোলের বালা’ গল্পের পূর্ণিমা : দুই তথাকথিত পাগল চরিত্রের মানসিক প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-02, February-2025.